أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِgبِسْمِ اللَّهِ ا

(Book# 114/E/60) www.motaher21.net

لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ

" ‘তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না "

" Shed not the blood of your people."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ৮৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثٰقَ بَنِيٓ إِسْرٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন বানী ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

৮৩ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, “সময়মত সালাত আদায় করা” । বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার" বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা” । [বুখারী ৫২৭, মুসলিম: ৮৫]

[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মিসকীন সে নয়, যে এক খাবার বা দুই খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় বরং মিসকীন হচ্ছে, যার সামর্থ নেই অথচ সে লজ্জায় কারও কাছে চায় না। অথবা মানুষকে আগলে ধরে কোন কিছু চায় না। ” [বুখারী: ১৪৭৬, মুসলিম: ১০৩৯]

[৩] আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলামনে বলবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মূসা ও হারূন ‘আলাইহিমাস সালাম-কে নবুয়ত দান করে ফি’ রআউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, “ তোমরা উভয়েই ফির’ আউনকে নরম কথা বলবে। " [সূরা ত্বা-হাঃ ৪৪]

আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা মূসা ‘আলাইহিস সালাম-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফিরআউন অপেক্ষা বেশী মন্দ বা পাপিষ্ঠ নয়। সুতরাং সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত। হাদীসে এসেছে, “তোমরা সৎকাজের সামান্যতম কিছুকে খাটো করে দেখ না। যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা। " [মুসলিম: ২৬২৬] তাছাড়া মানুষের সাথে সদালাপের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, তা হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

[৪] ‘অল্প কয়েকজন’ অর্থ, তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা ‘আলাইহিস সালাম প্রবর্তিত শরীআতের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরীআতের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, সালাত আদায় করা ও যাকাত দেয়া ইসলামী শরীআতসহ পূর্ববর্তী শরীআতসমূহেও ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেগুলো ত্যাগ করে।

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের ওপর আরোপিত নির্দেশাবলী এবং তাদের নিকট হতে গ্রহণকৃত প্রতিশ্রুতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তারা যেন মহান আল্লাহ্র একাত্মবাদ মেনে নেয় এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ‘ইবাদত না করে। শুধুমাত্র বানী ইসরাঈল নয়, বরং সমস্ত মাখলূকের প্রতিই এ নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

‘আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওয়াহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা ‘বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ‘ইবাদত করো। (২১ নং সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ২৫) তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

‘প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ সংবাদ দিয়ে যে, মহান আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো। (১৬ নং সূরা নাহল, আয়াত নং ৩৬) সবচেয়ে বড় হক মহান আল্লাহ্‌রই, আর তাঁর যতোগুলো হক আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে, তাঁরই ‘ইবাদত করতে হবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো ‘ইবাদত করা যাবে না।

মহান আল্লাহ্‌র হকের পর এখন বান্দাদের হকের কথা বলা হচ্ছে। বান্দাদের মধ্যে মা-বাবার হক সবচেয়ে বড় বলে প্রথমে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیْكَ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ﴾

‘সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।’ (৩১ নং সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৪) অন্যত্র তিনি বলেনঃ

﴿وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا﴾

‘তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।’ (১৭ নং সূরা ইসরাহ, আয়াত নং ২৩)

﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ﴾

‘আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও অর্থাৎ মুসাফিরকেও। (১৭ নং সূরা ইসরাহ, আয়াত নং ২৬)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছেঃ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস ‘ঊদ (রহঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ

يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال" :الصلاة على وقتها ."قلت :ثم أي؟ قال" :بر الوالدين ."قلت :ثم أيّ؟ قال" :الجهاد في سبيل الله"

‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সর্বোত্তম ‘আমল কোনটি? তিনি বলেনঃ যথা সময়ে সালাত আদায় করো। জিজ্ঞেস করেনঃ তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ মা-বাবার খিদমত করা। জিজ্ঞেস করেনঃ এরপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (সহীহুল বুখারী ২/৫২৭, সহীহ মুসলিম ১/১৩৭/৮৯। ফাতহুল বারী ৬/৫, সহীহ মুসলিম ১/৮৯) আর একটি সহীহ হাদীসে আছে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেনঃ

"يا رسول الله، من أبر؟ قال" :أمك ."قال :ثم من ؟ قال" :أمك ."قال :ثم من؟ قال" :أباك .ثم أدناك أدناك

‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি কার সাথে সৎ ব্যবহার করবো?’ তিনি বলেনঃ ‘তোমার মায়ের সাথে।’ আবার জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তারপর কার সাথে?’ তিনি বলেনঃ ‘তোমার বাবার সাথে এবং তারপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে।’ (সহীহুল বুখারী- ১০/৫৯৭১, সহীহ মুসলিম ৪/২/১৯৭৪, সুনান ইবনে মাজাহ-২/৩৬৫৮, সুনান বায়হাক্বী-৮/২, মুসনাদে আহমাদ-২/৩২৭,৩২৮,৩৯১) সূরা নিসার নিম্ন আয়াতের তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

﴿وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴾

‘আর তোমরা মহান আল্লাহ্‌রই ‘ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৬)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেনঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখো। আর সহনশীলতা ও ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ করো। এটাই উত্তম চরিত্র যা গ্রহণ করা উচিত। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৫৮)

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لا تحقرن من المعروف شيئًا، وإن لم تجد فَالْقَ أخاك بوجه منطلق"

কোন ভালো জিনিসকে ঘৃণা করো না, কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করো। (সহীহ মুসলিম ৪/১৪৪/২০২৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৭৩, তিরমিযী ৪/১৮৩৩) সুতরাং

মহান আল্লাহ প্রথমে তাঁর ‘ইবাদতের নির্দেশ দেন, তারপর পিতা মাতার খিদমত করা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সু-দৃষ্টি দেয়া এবং জনসাধারণের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। এরপর কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও আলোচনা করেন। যেমন বলেনঃ ‘সালাত আদায় করো, যাকাত দাও।’ তারপর এ সংবাদ দেন যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং অল্প লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে যায়। এ উম্মাতকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا﴾

আর তোমরা মহান আল্লাহ্‌রই ‘ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করোনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পাশ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অহঙ্কারী আত্মাভিমানীকে ভালোবাসেন না। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৬)

এই উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় এ সব নির্দেশ মানার ব্যাপারে এবং এর ওপর ‘আমল করার ব্যাপারে অনেক বেশি দৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে।

আসাদ ইবনে অদা ‘আহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে সালাম দিতেন। ফলে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদেরকে সালাম দেন কেন? তিনি এর উত্তরে মহান আল্লাহ্‌র এ নির্দেশটি দালীল রূপে পেশ করে বলেন যেঃ وقولوالن س حسن ‘তোমরা জন সাধারণের সাথে উত্তম রূপে কথা বলো।’ এখানে উত্তম কথা দ্বারা সালামই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বর্ণনাটি গারীব।

আমি (ইবনে কাসীর) বলবো এ হাদীসটি সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ উল্টো। কেননা সহীহ হাদীসে স্পষ্ট রূপে বিদ্যমান আছে যে সাহাবারা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রথমত السلم عليكم বলতেন না। (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস রয়েছে যে, لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ‘তোমরা প্রথমেই ইয়াহুদী-নাসারাদের সালাম দিয়ো না। বরং রাস্তায় তাদের সাথে সাক্ষাত ঘটলে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়ে সংকীর্ণ অবস্থায় যেতে বাধ্য করো। এ হাদীসটি রয়েছে সহীহ মুসলিম ৪/১৩/১৭০৭, সুনান আবূ দাউদ-৪/৫২০৫, জামি ‘ তিরমিযী-৫/২৭০০, মুসনাদে আহমাদ ২/২৬৩, ২৬৬, ৩৪৬) আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

৮৪ নং আয়াতে

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, ‘তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছ।

মাদীনার দু’ টি বিখ্যাত গোত্রের শান্তি চুক্তি এবং তা ভঙ্গ করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় মাদীনার ইয়াহুদীদের মন্দ কর্মসমূহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় আউস-খাযরায গোত্রদ্বয়ের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, মাদীনার আনসারগণের দু’ টি গোত্র ছিলোঃ (১) আউস ও (২) খাযরায। ইসলাম পূর্বে এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কখনো কোন মিল ছিলো না। পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। অপর দিকে মাদীনার ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র ছিলোঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানু নাযীর ও (৩) বানূ কুরাইযা। বানূ কাইনুকা ও বানূ নাযীর খাযরাজের মিত্র ছিলো এবং তারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলো। আর বানূ কুরাইযার বন্ধুত্ব ছিলো আউসের সাথে। আউস ও খাযরাযের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন ইয়াহুদীদের তিনটি দল নিজ নিজ মিত্রের সাথে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। দুই পক্ষের ইয়াহুদী স্বয়ং তাদেরই হাতে মারাও যেতো এবং সুযোগ পেলে একে অপরের ঘর বাড়ী ধ্বংস করতো এবং দেশ থেকে তাড়িয়েও দিতো। ধন-মালও দখল করে নিতো। অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পরাজিত দলের ইয়াহুদী বন্দীদেরকে ইয়াহূদীরা তাওরাতে বর্ণিত ‘কয়েদি মুক্তির’ নীতি-মালা দ্বারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিতো এবং বলতোঃ ‘আমাদের প্রতি তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। তারই উত্তরে মহান আল্লাহ তাদেরকে বলছেনঃ ‘এর কারণ কি এই যে, আমার এ হুকুম মানছো? কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা পরস্পর মারামারি করো না, একে অপরকে বাড়ী হতে বের করে দিয়ো না, তা মানছো না কেন? এক হুকুমের ওপর ঈমান আনা এবং অন্য হুকুমকে অমান্য করা, এটা আবার কোন ঈমানদারী?’ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করো না, নিজেদের লোককে তাদের বাড়ী হতে বের করে দিয়ো না। কেননা তোমরা এক মাযহাবের লোক এবং সবাই এক আত্মার মতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".

‘সমস্ত মু’ মিন পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া ও সাহায্য-সহানুভূতি করার ব্যাপারে একটি শরীরের মতো। কোন একটি অঙ্গের ব্যথার সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে থাকে, শরীরে জ্বর চলে আসে এবং রাতে নিদ্রা হারিয়ে যায়। (সহীহুল বুখারী ১০/৬০১১, সহীহ মুসলিম ৪/৬৬/১৯৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৭০) এরকমই একজন সাধারণ মুসলিমের বিপদে সারা বিশ্ব জাহানের মুসলিমদের অস্থির হওয়া উচিত।

আব্দ খায়ের (রাঃ) বলেনঃ ‘আমরা সালমান ইবনে রাবী ‘ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ‘বালানজারে’ (চীন দেশের নিকটবর্তী কোন একটি শহরের নাম) জিহাদ করছিলাম। সেটা অবরোধের পর আমরা ঐ শহরটি দখল করি। এর মধ্যে কিছু বন্দীও ছিলো। এদের মধ্যে একটি ক্রীতদাসীকে ‘আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সাতশ ’ দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। অতঃপর ‘আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ইয়াহুদীদেরই একজন ব্যক্তি ‘রাসূল জালুতের’ নিকট দিয়ে গমন কালে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে রাসূল জালূত! এ দাসীটি তোমার ধর্মের নারী। আমি একে সাতশ’ দিরহামের বিনিময়ে কিনেছি। এখন তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও।’ সে বলেঃ ‘খুব ভালো কথা, আমি চৌদ্দশ’ দিচ্ছি।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি চার হাজারের কমে একে বিক্রি করবো না।’ তখন সে বলেঃ ‘তাহলে আমার কেনার প্রয়োজন নেই।’ তিনি বলেনঃ ‘একে ক্রয় করো, নতুবা তোমার ধর্ম চলে যাবে। তাওরাতে লিখিত আছে, বানী ইসরাঈলের কোন একটি লোকও যদি বন্দী হয় তাহলে তাকে কিনে আযাদ করে দাও। সে যদি বন্দি অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে তাহলে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নাও এবং বাস্তুহারা করো না। এখন হয় তাওরাতকে মেনে তাকে ক্রয় করো, আর না হয় তাওরাতকে অস্বীকারা করো।’ সে বুঝে নেয় এবং বলেঃ ‘তুমি কি ‘আবদুল্লাহ ইবনে সালাম? তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ।’ সুতরাং সে চার হাজার নিয়ে আসে। তিনি দু’ হাজার তাকে ফেরত দেন। আদম ইবনে আবি ইয়াস (রহঃ) ও স্বীয় তাফসীরে এমনটি উল্লেখ করেছেন। (সনদ য ‘ঈফ)

মোট কথা, কুর’ আনুল কারীমের এ আয়াতটিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী জানা সত্ত্বেও তাকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছে। আমানতদারী ও ঈমানদারী তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী, তাঁর নির্দেশাবলী, তাঁর জন্মস্থান, তাঁর হিজরাতের স্থান ইত্যাদি সব কিছুতেই তাদের কিতাব লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবকিছুই তারা গোপন করে রেখেছে। শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করেছে। এ কারণেই তাদের ওপর ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এসেছে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি।

আল্লাহ তা ‘আলা অত্র আয়াতে বানী ইসরাঈদেরকে যে সমস্ত আদেশ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে আদেশগুলো আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার ইবাদত করবে, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে, সালাত কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নাবী-রাসূলগণকে এ পয়গাম প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

“আল্লাহর ‘ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।” (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন:

(وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَیْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ)

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ ওয়াহী ব্যতীত যে, ‘আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমারই ‘ইবাদত করো।’ (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

এবং এ তাওহীদ বা এক আল্লাহ তা ‘আলার ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা ‘আলা সকল জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ)

“আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা একমাত্র আমার ইবাদত করবে।” (সূরা যারিআত ৫১:৫৬)

এটাই হল বান্দার ওপর আল্লাহ তা ‘আলার সবচেয়ে বড় হক। আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর হকের সাথে সাথে মাখলুকের মধ্যে যারা সদাচরণ পাবার অধিক হকদার তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

(وَقَضٰي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ‘ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।” (সূরা ইসরা ১৭:২৩)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কোন আমল আল্লাহ তা ‘আলার নিকট সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: যথাসময়ে সালাত আদায় করা, তারপর পিতা-মাতার সাথে সদ্বব্যবহার করা। তারপর আল্লাহ তা ‘আলার রাস্তায় জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী হা: ৫২৭)

তাই সালাত, যাকাত ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের ইবাদত ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এটা সকল উম্মাতের মধ্যেই ছিল। এ উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও আল্লাহ তা ‘আলা একই নির্দেশ দিয়ে বলেন,

(وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে।” (সূরা নিসা ৪:৩৬)

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা তাদের থেকে আরো অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা জমিনে রক্তপাত করবে না, আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বীয় বাসস্থান থেকে বের করে দেবে না ইত্যাদি।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. প্রত্যেক উম্মাতেই সালাত, সিয়াম ও যাকাত ইত্যাদি মৌলিক ইবাদত ছিল, তবে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য ছিল।

২. আল্লাহ তা ‘আলার হকের পর মাখলুকের মাঝে যারা সবচেয়ে বেশি সদাচরণ পাওয়ার হকদার তারা হলেন পিতা-মাতা।

৩. প্রত্যেক নাবী তাদের স্বজাতীর কাছে তাওহীদের পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন এবং এ দিকেই আহ্বান করেছেন।

৮৫ নং আয়াতে

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-বেরাদারদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকান্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন।

৮৬ নং আয়াতে

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। কাজেই তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৮৫ ও ৮৬ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা ‘আলা ইয়াহূদীদের থেকে যে সকল অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তারা তা ভঙ্গ করে নিজেরা পরস্পর রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ শুরু করল। একে অপরকে স্বীয় বাসস্থান থেকে বের করে দিল এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে শুরু করল।

মদীনার আনসারদের দু’ টি গোত্র ছিল: ১. আউস ও ২. খাযরায। ইসলাম পূর্বযুগে এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কখনো কোন মিল ছিল না। পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। মদীনার ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র ছিল: ১. বনু-কাইনুকা, ২. বনু নাযীর ও ৩. বনু কুরাইযা।

বনু কাইনুকা ও বনু নাযীর খাযরাজের পক্ষপাতি ছিল এবং তাদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আর বনু কুরাইযার বন্ধুত্ব ছিল আউসের সঙ্গে। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হত তখন ইয়াহূদীদের তিনটি দল নিজ নিজ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্র “দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। দুই পক্ষের ইয়াহূদী স্বয়ং তাদেরই হাতে নিহত হত এবং সুযোগ পেলে একে অপরের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিত এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত। ধন-সম্পদও দখল করে নিত। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পরাজিত দলের বন্দীদেরকে তারা মুক্তিপণ দিয়ে

ছাড়িয়ে নিত এবং বলত, আমাদের প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার নির্দেশ আছে যে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ বন্দী হয়ে যায় তবে আমরা যেন তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। তারই উত্তরে মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন: এর কারণ কী যে, আমার এ হুকুম মানছ, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা পরস্পর হানাহানি কর না, একে অপরকে বাড়ি হতে বের করে দিও না, তা মানছ না কেন? এক হুকুমের ওপর ঈমান আনা এবং অন্য হুকুমকে অমান্য করা- এটা আবার কোন্ ঈমানদারী? আয়াতে আল্লাহ তা ‘ আলা বলেন:

(ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ)

“অনন্তর তোমরাই সেই লোক যারা (পরস্পর) তোমাদের নফসসমূহকে হত্যা করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ।” (সূরাহ বাকারাহ ২:৮৫)

কারণ তোমরা এক মতের লোক এবং সবাই এক আত্মার মত।

(اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ) –

‘তবে কি তোমরা গ্রন্থের (তাওরাতের) কিয়দাংশ বিশ্বাস কর’ এর পূর্বের অংশ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, তারা বন্দীদের মুক্তিপণের ওপরই শুধু ঈমান এনেছিল। আর লোকজনদেরকে স্বীয় বাসস্থান থেকে বের করে দেয়, তাদের সাথে যুদ্ধ করে এ অংশের প্রতি কুফরী করেছিল। যারা এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করে আল্লাহ তা ‘ আলা দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও পরকালে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ বিধান শুধু ইয়াহূদীদের জন্য নয় বরং মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য। অতএব কুরআনের কিছু বিধান মানব আর কিছু বিধান মানব না এমন আচরণ হলে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নিজের কুপ্রবৃত্তি বা দলের ও মতের সাথে শরীয়তের যে সকল বিধান মুআফিক হবে তা মানব আর যা মুআফিক হবে না তা মানব না এরূপ করা কুফরী কাজ।

২. আমাদের উচিত ইসলামের সকল বিধানকে মাথা পেতে মেনে নেয়া। অন্যথায় মুসলিম হতে পারব না।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৮৭

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগতভাবে রসূল পাঠিয়েছি। অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিশানী দিয়ে এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি। এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোন রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, কাউকে মিথ্যা বলেছো এবং কাউকে হত্যা করেছো।

৮৭ নং আয়াতের তাফসীর:

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং নবীদের হত্যা করা

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, অহঙ্কার এবং প্রবৃত্তি পূজার বর্ণনা দিচ্ছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ উল্লেখ করেন যে, তিনি মূসা (আঃ)-কে তাওরাত দিয়েছিলেন। তারা তাওরাতের পরিবর্তন সাধন ও পরিবর্ধন করলো। তাঁর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কর্ম করলো। মূসা (আঃ) এর পরে তাঁর শারী ‘আত নিয়ে অন্য যে সব নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন যারা তাঁর শারী ‘আত মুতাবিক বিচার ফায়সালা করতো। তাঁদের তারা বিরোধিতা করলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

‘আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিলো এবং আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর আলো ছিলো, মহান আল্লাহ্‌র অনুগত নবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করতো আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং ‘আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিলো। (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৪৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক (রহঃ) বলেছেন যে, قَفَّيْنَا ‘কাফফাইনা’ শব্দের অর্থ হলো সাফল্য লাভ। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৬৮) অন্যান্যরা বলেছেন ‘অনুসরণ।’ উভয় অর্থই যথার্থ বা যুক্তিগ্রাহ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। (২৩ নং সূরা মু’ মিনূন, আয়াত নং ৪৪)

মোট কথা, ক্রমান্বয়ে নবীগণ বানী ইসরাঈলের মধ্যে আসতে থাকেন এবং ‘ঈসা (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। ‘ঈসা (আঃ)-কে ইঞ্জিল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কতোগুলো নির্দেশ তাওরাতের বিপরীতও ছিলো। এ জন্যই তাঁকে নতুন নতুন মু ‘জিযাহও দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে তাকে উড়িয়ে দেয়া। মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দেয়া। তাঁর হুকুমে কতোগুলি ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৬৮)

অতঃপর মহান আল্লাহ ‘ঈসা (আঃ)-কে সহায়তার জন্য ‘রূহুল কুদুস’ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)-কে নিযুক্ত করেন। অথচ বানী ইসরাঈলরা তার প্রতি বেশি বিরুদ্ধাচরণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং তাওরাতে যে ‘ঈসা (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। কুর’ আনে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۱ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ﴾

‘আমি এসেছি তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে।’ (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৫০)

অথচ বানী ইসরাঈলরা বিভিন্ন নবীর (আঃ) সাথে অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে অস্বীকার করেছে এবং কেউ কাউকে হত্যা করেছে। এসব কিছুই ঘটেছিলো এ জন্য যে বানী ইসরাঈলরা যা আশা করতো অথবা বিশ্বাস করতো তার বিপরীত কথাই নবীগণের দা ‘ওয়াতের বিষয় ছিলো। তাওরাতের যে সমস্ত বিষয় বানী ইসরাঈলরা পরিবর্তন করেছিলো ঐ সমস্ত বিষয় নবীগণ পুর্নবহাল করতে চাইলে তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নবীগণকে মেনে নেয়া তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা নবীগণকে অস্বীকার করে এবং হত্যা করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করতো না তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহঙ্কার করলে, অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৮৭)

জিবরাঈল (আঃ)-এর অপর নাম রূহুল কুদুস

‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস ‘ঊদ (রাঃ), ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবনে কা ‘ব (রহঃ) ইসমা ‘ঈল ইবনে খালিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ‘ইবনে আনাস (রহঃ), ‘আতিয়্যা আল আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীবর্গের এটাই অভিমত যে, রূহুল কুদুসের ভাবার্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৭০) কুর’ আন মাজীদে এক স্থানে আছেঃ

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۙ﴿۱۹۳﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ﴾

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (২৬ নং সূরা শু ‘আরা, আয়াত নং ১৯৩-১৯৪)

সহীহুল বুখারীতে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসসান কবির (রাঃ) মাসজিদে একটি মিম্বার রাখেন। তিনি মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য প্রার্থনা করতেনঃ

"اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك"

‘হে মহান আল্লাহ! আপনি রূহুল কুদুস দ্বারা হাস্‌সান (রাঃ)-কে সাহায্য করুন। সে আপনার নবীর পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১/৬৫৩, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৬৫৭, সুনান আবূ দাঊদ ৪/৫০১৫, জামি ‘ তিরমিযী ৫/২৮৪৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৪৮৭)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ‘উমার ফারূকের (রাঃ) খিলাফাত ‘আমলে একবার হাস্‌সান (রাঃ) মাসজিদে নবাবীতে কবিতা পাঠ করছিলেন। ‘উমার (রাঃ) তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বলেনঃ ‘আমি তো ঐ সময়েও এখানে এ কবিতাগুলো পাঠ করতাম, যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতেন।’ অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেনঃ ‘হে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)! মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলুন তো, আপনি কি মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেননি? ‘হাস্‌সান (রাঃ) মুশরিকদের কবিতার উত্তর দিয়ে থাকে, হে মহান আল্লাহ! রূহুল কুদ্দুস দ্বারা তাকে সাহায্য করুন?’ আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আমি শুনেছি।’ (সহীহুল বুখারী ৬/৩২১২, সহীহ মুসলিম ৪/১৫১/১৯৩২, ১৯৩৩, সুনান নাসাঈ ২/৭১৫, সুনান আবূ দাউদ-৪/৫০১৩) কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাস্‌সান (রাঃ)-এর জন্য দু ‘আ করে বললেনঃ "أهجهم -أو :هاجهم-وجبريل معك".

তুমি প্রতুত্ত্যর করো, জিবরাঈল আমীন তোমার সাথে আছে। (সহীহুল বুখারী ৬/৩২১৩, সহীহ মুসলিম ৪/১৫৩/১৯৩৩) হাসসান (রহঃ)-এর কবিতার মধ্যে জিবরাঈল (আঃ) কে রুহুল কুদ্দুস বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রুহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি যে তোমরা মহান আল্লাহ্‌র নি ‘য়ামতসমূহ স্মরণ করে বলো তো তিনি যে হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ) তা কি তোমরা জানো না? তারা সবাই তখন বলেঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। (সনদ শাওহর ইবনে হাওশাব নামের একজন য ‘ঈফ রাবী রয়েছে, যিনি মুরসাল করেও বর্ণনা করতেন। ইবনে ইসহাক)

ইবনে হিব্বান (রহঃ) এর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"إن روح القدس نفخ في روعي :إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"

‘রুহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জানালেনঃ কোন লোকই স্বীয় আহার্য ও জীবন পুরা করা ছাড়া মারা যায় না। মহান আল্লাহকে তোমরা ভয় করো এবং দুনিয়া কামানো ব্যাপারে দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য রেখো।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ ইবনে হিব্বান- ২৬৭, তামহীদ-১/২৮৪, আস সুন্নাহ ১৪/৩০৪)

কেউ কেউ রুহুল কুদ্দুস অর্থ ইসমে ‘আযমও নিয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন যে রুহুল কুদ্দুস হচ্ছেন ফেরেশতাদের একজন সরদার ফেরেশতা। কেউ কেউ বলেন যে, কুদুস এর অর্থ হলো আল্লাহ তা ‘আলা এবং রুহের অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। আবার কেউ বলছেন যে কুদুস এর অর্থ বরকত এবং কেউ বলছেন পবিত্র। কেউ কেউ বলছেন যে রুহু এর ভাবার্থ হচ্ছে ইনজীল। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا

‘এভাবেই আমি আমার হুকুম দ্বারা তোমার কাছে রুহের ওয়াহী করেছি।’ (৪২ নং সূরা আশ-শুরা আয়াত ৫২)

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ)-এর স্থির সিদ্ধান্ত এটাই যে, এখানে ‘রুহুল কুদ্দুস’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিবরাঈল (আঃ)। কেননা মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ‘রুহুল কুদুস’ এর মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-কে শক্তিশালী করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۗ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ ﴿الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ﴾

‘স্মরণ করো যখন মহান আল্লাহ বলেছিলেন, “হে ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম! তুমি তোমার প্রতি আর তোমার মায়ের প্রতি আমার নি ‘য়ামতের কথা স্মরণ করো। স্মরণ করো, আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দিয়ে শক্তিশালী করেছি।’ (৫নং সূরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত-১১০)

অত্র আয়াতের ‘রূহুল কুদ্দুস’ দ্বারা সাহায্য করার বর্ণনার সাথে সাথে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিখানোরও বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, এটা এক জিনিস এবং এগুলো অন্য জিনিস। রচনা রীতিও এটার অনুকূলে রয়েছে। ‘কুদুস’ এর ভাবার্থ হচ্ছে মুকাদ্দাস, যেমন حاتم جود এবং رجل صادق এর মধ্যে। روح القدس ও روح منه বলার মধ্যে নৈকট্য ও মাহাত্ম্যের একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এটা এ জন্যও বলা হয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির রুহ দ্বারা ‘ঈসা (আঃ) এর রুহ অর্থ নিয়েছেন। কেননা তার রুহ মানুষের পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়েছিলো

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ‘কিছু সংখ্যক অস্বীকার করেছেন এবং কিছু সংখ্যক কে হত্যা করেছো।’ অস্ত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যামাখশারী (রহঃ) বলেনঃ মহান আল্লাহ্‌র এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, ‘তারা হত্যা করেছিলো।’ বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতেও তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। কারণ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলো। তারা বিষ প্রয়োগ করে ও যাদুর মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করে। অসুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি বলেনঃ

"ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري"

‘খাইবারের যুদ্ধের সময় তারা অর্থাৎ ইয়াহুদীরা আমাকে যে বিষ মিশ্রিত খাসীর গোস্তখাদ্য হিসেবে খেতে দিয়েছিলো তার প্রতিক্রিয়া আমি এখনো উপলব্ধি করছি, এখনতো হৃদপিণ্ডের মূল ধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার পথে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৭/৪৪২৮, সুনান আবূ দাউদ- ৪/৪৫১২, সুনান দারিমী- ১/৪৬/হা ৬৭, মুসনাদ আহমাদ ৬/১৮। তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ৩/১২৩৯, ফাতহুল বারী ৭/৭৩৭)

‘পবিত্র রূহ’ বলতে অহী-জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। অহী নিয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী জিব্রীলকেও বুঝানো হয়েছে। আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পাক রূহকেও বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। ‘উজ্জ্বল নিশানী’ অর্থ সুস্পষ্ট আলামত ও চিহ্ন, যা দেখে প্রত্যেকটি সত্যপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে চিনতে পারে।

আল্লাহ তা ‘আলা বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, অহমিকা ও প্রবৃত্তি পূজার বর্ণনা তুলে ধরার পর যে সকল নেয়ামত তাদেরকে প্রদান করেছিলেন তার অন্যতম একটি এখানে উল্লেখ করে বলছেন যে, আমি মূসাকে কিতাব তথা তাওরাত দান করেছি। কিন্তু তারা (ইয়াহূদীরা) তাওরাতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে এবং তার নির্দেশ অমান্য করেছে ও অপব্যাখ্যা করেছে। মূসা (আঃ)-এর পর বানী ইসরাঈলের মধ্যে আল্লাহ তা ‘আলা ধারাবাহিকভাবে নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেন তারা তাওরাতের বিধি-বিধান অনুপাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ)

"আমি তো অবতীর্ণ করেছিলাম তাওরাত যাতে ছিল হিদায়াত ও নূর। এ তাওরাতের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের মীমাংসা দিত আল্লাহর অনুগত নাবী, দরবেশ ও 'আলিমরা। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের হিফাযাতের আদেশ প্রদান করা হয়েছিল আর তারা ছিল তার সাক্ষী।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৪৪)

কিন্তু বানী ইসরাঈলরা নাবীদের সাথে খুব অসদাচরণ করত। এসনদটি তারা কোন কোন নাবীদেরকে হত্যাও করেছে। আবার কোন কোন নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর কারণ ছিল এটাই যে, নাবীরা যা কিছু নিয়ে আসত তা তাদের মনঃপুত হত না। যেমন আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ)

"কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করত না তা নিয়ে উপস্থিত হল, তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।" (সূরা বাকারাহ ২:৮৭)

বানী ইসরাঈলের মাঝে নাবীদের আগমনের ধারাবাহিকতায় মূসা (আঃ)-র পর ঈসা (আঃ)- আগমন করেন। তিনি বানী ইসরাঈলের সর্বশেষ নাবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ইঞ্জিল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর পর থেকে শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত কোন নাবী আগমন করেননি। এ সময়টাকে

فَتْرَةُ الرُّسُلِ

বা রাসূল আগমনের বিরতিকাল বলা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা 'আলার হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরীয়ত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়িম করবেন। আল্লাহ তা 'আলা তাঁকে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করেছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۚ)

“আর তিনি হবেন বানী ইসরাঈলের একজন রাসূল। (তিনি কওমের কাছে গিয়ে বলবেন) আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কিছু নিদর্শন নিয়ে এসেছি। যেমন আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখি আকৃতির ন্যায় তৈরী করব, তারপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে আল্লাহর নির্দেশে তা পাখিতে পরিণত হবে। আর আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগীকে ভাল করে দেব, মৃতকে জীবিত করব এবং তোমরা যা খাও এবং তোমাদের ঘরে যা জমা রাখ তাও বলে দেব।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:৪৯)

(وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ)

‘জিবরীল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি’ রুহুল কুদুস হলেন জিবরীল (আঃ)। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)

জিব্রাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। (সূরা শুআ ‘রা ২৬:১৯৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

اللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ما نَافَحَ عن نَبِيِّكَ

হে আল্লাহ! তুমি হাসানকে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী কর যতক্ষণ সে আপনার নাবীর পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে। (আবূ দাঊদ হা: ৫০১৫, তিরমিযী হা: ২৮৪৬, সহীহ) অতএব বুঝা যাচ্ছে রুহুল কুদুস দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিবরীল (আঃ)। আল্লাহ তা ‘আলা ঈসা (আঃ)-কে জিবরীল দ্বারা সহযোগিতা করেছিলেন।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা নাবীদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

২. নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দেন তা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে অন্যথায় মু’ মিন হওয়া যাবে না, যেমন বানী ইসরাঈলের এক শ্রেণি নাবীদের পয়গাম মনঃপুত না হলে মেনে নিত না।